আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অমর-প্রতিভা-সিরিজ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অমর-প্রতিভা-সিরিজ

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সংস্কার ও পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

('কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির' প্রতিষ্ঠাতা)

শরৎ সাহিত্য ভবন

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

(জীবন চরিত)

এক

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট। বাংলা দেশের পক্ষে সে এক গৌরবের দিন। ঐদিন বিশ্ববিশ্রুত রাসায়নিক, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বাংলার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রামের নাম রাড়ুলি—পূর্বে ইহা যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল—এখন খুলনা জেলার অন্তঃপাতী।

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতার নাম হরিশচন্দ্র রায়, পিতার তিনি তৃতীয় পুত্র ছিলেন। রাড়ুলির রায়পরিবার অতি সম্ভ্রান্ত বংশ। বিত্তবান ভূস্বামী বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি ছিল। হরিশচন্দ্রের পিতা ও পিতামহ উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট উপার্জন করিয়া যান। কিন্তু হরিশচন্দ্রকে ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রথম যৌবন হইতেই স্বগ্রামে বাস করিতে হইয়াছিল। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসীতে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ফারসী কবি হাফিজ ও সাদীর কাব্য তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। এবং সম্ভবতঃ ফার্সী কবিতার প্রভাব তাঁহার চরিত্রকেও অনেক অংশে প্রভাবিত করিয়াছিল।

গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন। গোপনে কুক্কুটমাংস ভোজনে তাঁহার সে উদারতা প্রকাশ পাইত। একবার পাড়ায় এক প্রতিবেশীর একটী গোবৎস হারাইয়া যায়। দুষ্টলোকে রটাইয়া দেয়—হরিশচন্দ্র বৎসটীর মাংসে কাটলেট পাকাইয়া ভোজন করিয়াছেন। তিনি একবার গ্রামে এক বিধবাবিবাহ দিবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতা কর্মস্থান কৃষ্ণনগর হইতে পাল্কী করিয়া ছুটিয়া আসেন এবং তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলে আসন্ন বিধবাবিবাহটি পণ্ড হইয়া যায়।

হরিশচন্দ্রের পৈত্রিক ভূসম্পত্তির আয় আনুমানিক বার্ষিক ৬০০০৲ টাকার মত ছিল। ইহার উপর তেজারতি কারবার তাঁহার ছিল। গ্রামবাসীরা দস্যু তস্করের ভয়ে সঞ্চিত অর্থ তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিত, তিনি তাহা লগ্‌নিতে খাটাইতেন। এরূপেও তাঁহার প্রায় তিন চারি হাজার টাকার বার্ষিক আয় ছিল।

আজকাল বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়কে একটা বৃহৎ আয় বলিয়া কেহই মনে করে না—কিন্তু সে সময়ে ঐ অর্থে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

রাজোচিত আড়ম্বরে দিন যাপন করা চলিত, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে। হরিশচন্দ্র ঠিক জমিদারী কায়দাতেই বসবাস করিতেন। তাঁহার পাইক বরকন্দাজ আমলা গোমস্তা সবই ছিল। অন্দরমহলে ও সদরমহলে বিভক্ত পাকা বাটী ছিল—সদরে কাছারী ঘরে তিনি রীতিমত দরবার করিয়া বসিতেন। এবং সে দরবারে ছোটখাট গ্রাম্য মামলার বিচার নিস্পত্তিও হইত।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পুত্রদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য হরিশচন্দ্রকে কলিকাতায় বাস করিতে হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন মাইনর পাশ করিয়াছে। তখন এন্ট্রান্স স্কুল যশোহর জেলার ভিতর একটীও ছিল না। কলিকাতায় হিন্দু ও হেয়ার স্কুল ছিল ইংরাজী শিখিবার বিদ্যাপীঠ। হরিশচন্দ্র ঠিকই ধরিয়াছিলেন যে, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা জীবনে উন্নতি লাভের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে। তাই সমূহ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াও তিনি পুত্রগণের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন বোর্ডিং হোষ্টেলের সৃষ্টি হয় নাই—কোমলমতি শিশু পুত্রগণের তত্ত্বাবধানের জন্য কাজেই তাঁহাকেও সস্ত্রীক কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ১৩২নং বাড়ীটি ভাড়া করিয়া তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। প্রায় দশ বৎসর রায় পরিবার এই গৃহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভ্রাতৃগণ সহ প্রফুল্লচন্দ্রকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। ভবানীচরণ দত্ত লেনের দিকে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

মুখ করিয়া যে একতলা বাড়ীটি এখনও বর্ত্তমান আছে, হেয়ার স্কুল তখন ঐখানেই বসিত।

সহপাঠীরা যেই জানিতে পারিল যে, প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়ী যশোহর জেলায়, অমনি তাহারা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তাঁহার নামকরণ হইল, 'বাঙ্গাল'। বাঙ্গালগণের সমস্ত কল্পিত দোষ ও ত্রুটি তাঁহার উপর আরোপ করিয়া তাঁহাকে সকলে পরম বিদ্রূপের পাত্র বলিয়া সাব্যস্ত করিল। হায়! তাহাদিগকে বলিয়া কি লাভ হইবে যে, তাহাদের উপহাসের বস্তু ঐ যশোহর জেলাই একদিন প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের বীরত্বলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, ঐ যশোহর জেলায়ই দীনবন্ধু ও মধুসূদন জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গবাণীর গৌরব স্তম্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন!

শৈশব হইতেই পাঠানুরাগ ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারিত না। যাহা পাইতেন, তাহাই তিনি পড়িতেন! যখন তাঁহার বয়স মাত্র বারো বৎসর, তখনই তিনি শেষ রাত্রে ৪টা বা ৩টার সময় উঠিয়া আপন মনে অধ্যয়ন করিতেন। পরে অবশ্য স্বাস্থ্যহানিকর বলিয়া এ অভ্যাস তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইতিহাস ও জীবনী ছিল তাঁহার অধ্যয়নের প্রিয়সামগ্রী। চেম্বার্স-এর Biography (জীবনী সংগ্রহ) তিনি আদ্যোপান্ত বহুবার পাঠ করিয়াছিলেন। নিউটন, গ্যালিলিও, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, সার উইলিয়ম জোন্‌স্, জন লীডেন প্রভৃতির জীবন

বৃত্তান্ত তাঁহাকে সেই বয়সেই মুগ্ধ করিত। জোন্স-এর যে কোন জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁহার মাতার সেই একই উত্তর "Read and you will know" (পড়িলেই জানিতে পারিবে)—প্রফুল্লচন্দ্রকেও অতিমাত্রায় পাঠানুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের উপর অনুরাগ এই সময় হইতেই প্রফুল্লচন্দ্রের অন্তরে বদ্ধমূল হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির বক্তৃতা শুনিয়া ও লেখা পড়িয়া তখন হইতেই তাঁহার ধর্ম বিশ্বাস একটী বিশেষ রূপ প্রতিগ্রহ করিতেছিল। হিন্দু-সমাজের জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার উপর তখন হইতেই তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে। বিধবার দুর্গতি, বাল্য বিবাহের বিষময় পরিণাম প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার মত তখন হইতেই গড়িয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক সাম্যের দিকটাই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া-ছিল বেশী। ১৮৭১ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়া কেশবচন্দ্র 'সুলভ সমাচার' নামে একখানি সাপ্তাহিক (এক পয়সার) প্রচার করিতে থাকেন। কত নূতন নূতন ভাবে পূর্ণ থাকিত সেই পত্রিকা! প্রফুল্লচন্দ্র ইহার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। টাউন-হলেই হউক, বা এলবার্ট হলেই হউক—কেশবচন্দ্রের কোন বক্তৃতাই তিনি বাদ দিতেন না।

১৮৭৪ সালে একটী ঘটনায় প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। তিনি তখন ফোর্থ ক্লাসে পড়েন। আগষ্ট মাসে

তাঁহার দারুণ আমাশয় ব্যাধি হয়। স্বভাবতঃ তাঁহার স্বাস্থ্য অতি উত্তম ছিল। কিন্তু কুক্ষণে এই কাল ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। ইহার প্রথম প্রকোপ তিনি কাটাইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু ইহার নাগপাশ হইতে তিনি জীবনে আর কোনদিন মুক্তি পাইলেন না। ডিসপেপসিয়া রূপে ইহা তাঁহার সঙ্গের সাথী হইয়া রহিল। তাঁহার শরীরের পুষ্টি ব্যাহত হইল। আহার বিষয়ে তাঁহাকে অতি কঠোর সংযম অভ্যাস করিতে হইল—স্কুলে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া তিনি বাড়ীতে বসিয়া নিজমনে স্বেচ্ছানুরূপ অধ্যয়নে রত হইলেন। ইহা একদিকে তাঁহার শাপে বর হইল।

স্কুলের রুটিনের বাঁধাবাঁধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রফুল্ল-চন্দ্র এইবার চতুর্দিক হইতে জ্ঞান আহরণে ব্যাপৃত হইলেন। যেখানে যত বই চোখে পড়িল, পড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রবেশিকা-পাঠ্য Selections from Modern English Literature তিনি বারবার করিয়া পড়িলেন। Vicar of Wakefield, Scenes from Clerical life, Half Hours with the Best Authors এবং Shakespeare-এর Merchant of Venice ও Julius Caesar অতি অল্প দিনের ভিতরই তাঁহার পড়া হইয়া গেল।

বাংলা পড়ায়ও তিনি উদাসীন ছিলেন না। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' মাসিক আকারে প্রকাশিত

হইতে থাকে। বঙ্গ ভাষায় নব যুগ আসিল। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে এই পত্রিকায় বাহির হইতেছিল। উপন্যাসের রচনানৈপুণ্য বা গঠন সৌকর্য্য বুঝিবার মত শক্তি তাঁহার তখন না থাকিলেও আখ্যান ভাগের মনোহারিত্বে আকৃষ্ট হইয়া প্রফুল্লচন্দ্র সাগ্রহে বইখানি পড়িয়া চলিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত আর্য্যদর্শনও এই সময় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-চরিত এই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে অনূদিত হইতে থাকে। প্রফুল্লচন্দ্র ইহার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। মিলের জীবন চরিতে একটি বিষয় তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। জনের পিতা জেমস মিল জনকে স্কুলে দেন নাই, গৃহেই তাঁহাকে পড়াইতেন। ইহার ফলে যখন তাঁহার বয়স মাত্র দশ বৎসর, তখনই তিনি লাটিন ও গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন। তাহা ছাড়া গণিতে ও ইংলণ্ড, স্পেন ও রোমের ইতিহাসে তাঁহার প্রভূত জ্ঞান জন্মিয়াছিল।

তখন সোমপ্রকাশ, দ্বৈভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি সাপ্তাহিক আকারে বাহির হইতেছে। ইণ্ডিয়ান-মিরর তখন এদিককার একমাত্র ইংরেজী দৈনিক। প্রফুল্লচন্দ্র এই সবগুলি কাগজই নিয়মিত পাঠ করিতেন।

এই সময়ে একদিন তিনি বাড়ীতে Principia Latina নামে একখানি লাটিন ব্যাকরণের উপক্রমণিকা দেখিতে

পান। বইখানি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কোন পুরাতন পুস্তকের দোকানে দেখিতে পাইয়া খেয়ালের বশে আনিয়াছিলেন। কৌতূহল বশে পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে প্রফুল্লচন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে; বইখানি দুর্বোধ্য নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের রচনা পদ্ধতির সহিত ইহার বহুল সাদৃশ্যও তিনি লক্ষ্য করিলেন। তখনই তিনি এই বই আয়ত্ত করিতে বসিয়া গেলেন ও কিছু দিনের ভিতরই শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে, শুধু এই পুস্তকের ও নিজের চিন্তাশীলতার সাহায্যে তিনি ল্যাটিন ভাষার মূল সূত্রগুলি শিখিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে ব্যাধি বশতঃ গৃহে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হওয়ার দরুণই তিনি সত্যকার অধ্যয়নের অখণ্ড অবসর পাইয়াছিলেন। এই ব্যাধির জন্যই তাঁহাকে মিতাহারী ও ব্যায়ামশীল হইতে হইয়াছিল, এই সব কারণে তিনি ইহাকে চিরদিন 'শাপে বর' বলিয়া মনে করিতেন। এদিক দিয়া অনেক বিখ্যাত মনীষীর সহিত তাঁহার মিল ছিল। কার্লাইল চিরদিন শূলবেদনায় ভুগিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সারও তাই। কিন্তু ইহারা মিতাহার ও সংযম এবং নিয়মিত ব্যায়ামের সাহায্যে ব্যাধিকে দমিত রাখিয়া নিজ নিজ জীবনে জ্ঞানচর্চার যে অপরিসীম সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যাধিক্লিষ্ট জীবনে চিরদিনই অভিনব উদ্দীপনা ও প্রেরণা সঞ্চার করিত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র গৃহে বসিয়া নিজের চেষ্টায় French Principia (ফরাসী ভাষার ব্যাকরণ) আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

অবশেষে এক সময়ে এই দারুণ আমাশয় ব্যাধির প্রকোপ মন্দীভূত হইয়া আসিল ও প্রফুল্লচন্দ্র আবার বিদ্যালয়ে যোগদান করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার পিতা এবিষয়ে পুত্রের অভিপ্রায়ের উপর হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই, কারণ ঐ অল্প বয়সেই প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেয়ার স্কুলের সমপাঠীরা এতদিনে দুই ক্লাস উপরে উঠিয়া গিয়াছেন, এইজন্য প্রফুল্লচন্দ্র আর সেখানে যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত আলবার্ট-স্কুলে যোগদান করিলেন। কেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন এই বিদ্যালয়ের রেক্টর। কিন্তু তিনি তখন অস্থায়ী-ভাবে জয়পুর মহারাজার কলেজে প্রিন্সিপাল হইয়া দূরে প্রবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার স্থলে আলবার্ট স্কুলে কাজ করিতেছিলেন শ্রীনাথ রাও। শিক্ষকেরা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের লোক—জাতিভেদ মানেন না। অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ফলে গৃহ হইতে বিতাড়িত, পিতামাতার স্নেহাশ্রয়বিচ্যুত। কিন্তু কাহারও সেজন্য আক্ষেপ নাই, সানন্দে সন্তুষ্টচিত্তে ব্রাহ্মধর্মের পতাকা হস্তে তাঁহারা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন।

দুই এক মাস এই নূতন স্কুলে কাটিতে না কাটিতেই প্রফুল্লচন্দ্রের উপর শিক্ষকগণের দৃষ্টি পড়িল। অন্য সমস্ত ছাত্রের

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

তুলনায়, প্রফুল্ল চন্দ্র যে সর্ব বিষয়েই কতটা অগ্রসর, তাহা বুঝিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইল না। সকলেই প্রফুল্লচন্দ্রকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হেয়ার স্কুলের তুলনায় আলবার্ট স্কুল খুবই নিষ্প্রভ বোধ হইতে লাগিল প্রফুল্লচন্দ্রের নিকটে। তিনি মনস্থ করিলেন তিনি আবার হেয়ার স্কুলে ফিরিয়া যাইবেন। এইজন্য তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় উপস্থিত না হইয়া পরীক্ষার সমকালে রাড়ুলির পল্লীবাটীতে চলিয়া গেলেন। প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন কলিকাতা সহরে কাটাইয়া গেলেও মনে প্রাণে তিনি পল্লীর মানুষ ছিলেন। কলিকাতার বাসায় হরিশচন্দ্রের নিকট বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির সমাগম হইত, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত প্রফুল্ল মন খুলিয়া মিশিতে পারিতেন না। নিজেকে একটা স্বাতন্ত্র্যের ভিতর ধরিয়া রাখিতেন। কিন্তু এ স্বাতন্ত্র্য তাঁহার জীর্ণ পরিচ্ছদের ন্যায় খসিয়া পড়িত—পল্লীতে ফিরিয়া গেলে। সেখানে তিনি পল্লীবাসীগণের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইতেন। তাহাদের সহিত হাসিগল্প করিয়া, তাহাদের দুঃখ দুর্গতির বিবরণ শুনিয়া ও তাহার প্রতিকারে নিজের শৈশবোচিত সামান্য শক্তি নিযুক্ত করিয়া তিনি তাহাদের বুঝাইয়া দিতেন যে, জমিদার বাটীর ছেলে প্রফুল্লচন্দ্রও তাহাদেরই একজন। সেকালে গ্রামে সাগু, বার্লি, চিনি, মিছরির একান্ত অভাব ছিল। মুদীর দোকান গ্রামে থাকিত না বলিলেই চলে। অথচ ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উক্ত দ্রব্যগুলি অপরিহার্য্য। সেইজন্য যখনই

দেশে যাইতেন, প্রফুল্লচন্দ্র সাগু বার্লি চিনি মিছরির একটা মোট সঙ্গে রাখিতেন। মুক্তহস্তে তাহা দীন দরিদ্র পল্লীবাসীর ভিতর বিতরণ করিতেন। এবিষয়ে তাঁহার মাতার সহানুভূতিও ছিল অসীম।

১৮৭৬ সালের জানুয়ারীতে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে আলবার্ট-স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সার্টিফিকেট চাহিলেন। কিন্তু আলবার্টের শিক্ষকগণ একবাক্যে প্রফুল্লকে এরূপ কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাদের নির্বন্ধাতিশয্যে প্রফুল্লকে অগত্যা নিরস্ত হইতে হইল। তিনি আলবার্টেই পড়িতে থাকিলেন। তিনি বার্ষিক পরীক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া পুরস্কার বিতরণের দিন একটী বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হইল—সর্বাঙ্গীন সুশিক্ষার জন্য। উত্তরকালে প্রফুল্লচন্দ্র বলিতেন যে, আলবার্ট স্কুল ত্যাগ না করায় তিনি উপকৃতই হইয়াছিলেন। হেয়ার স্কুল ছিল প্রকাণ্ড ব্যাপার, সেখানে শিক্ষকে ছাত্রে কোন ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বন্ধন থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আলবার্টে ব্যাপার ছিল অন্যরূপ। সেখানে ছাত্র কম। শিক্ষকগণ প্রত্যেকটি ছাত্রকেই চিনিতেন ও বুঝিতেন। যাহার যেমন প্রয়োজন, ব্যক্তিগত সাহায্য ও সাহচর্য্য প্রদান করিতে শিক্ষকেরা সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। ইহার ফলে ছাত্র শিক্ষকে মধুর সম্বন্ধ ত গড়িয়া উঠেই,

তাহা ছাড়া ছাত্রদের চরিত্রগঠন অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া উঠে। হেয়ার স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষক চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীকে বলিত, 'বাঘা চণ্ডী'—কারণ তাঁহার দেহও ছিল বিশাল এবং মুখ ও গোঁফও ছিল বাঘের মত। তাঁহার ভ্রূকুটি দেখিলে ছাত্রদের দেহ কাঁপিয়া উঠিত। পক্ষান্তরে আলবার্ট স্কুলের শিক্ষকেরা সকলেই ছিলেন কোমল-প্রকৃতি ও ভদ্র। বিশেষ করিয়া আদিত্যকুমার ব্যানার্জী ছিলেন অতি মহৎ ও আদর্শ শিক্ষক। মহেন্দ্রনাথ দাঁও ছাত্রদের অতি প্রিয় ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র অনেক সময়েই ইঁহাদের গৃহে গিয়া দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করিতেন। শিক্ষা ছাড়াও অনেক বিষয়ে তাঁহারা প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতেন। ব্রাহ্মধর্মের নীতি ও সমাজব্যবস্থা তাঁহাদের একটী প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁহাদেরই নিকট তিনি বুঝিয়াছিলেন অন্য ধর্ম হইতে ব্রাহ্মধর্মের পার্থক্য কোথায়। তাঁহারা বলিতেন—"ব্রাহ্মধর্ম অপৌরুষেয় নয়—ইহা যুক্তিবাদী। কোন মহাপুরুষ এ ধর্মের সৃষ্টি করেন নাই—ইহা জন্মিয়াছে সাধারণ মানবের বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন হইতে। ইঁহাদের সাহচর্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি শ্রদ্ধার সহিত ইঁহাদিগকে স্মরণ করিতেন —যেমন রাগবি স্কুলের ছাত্রেরা শ্রদ্ধা করিতেন ডাক্তার আর্ণল্ডকে।

এই সময়ে জয়পুর হইতে কৃষ্ণবিহারী সেনও ফিরিয়া আসিলেন—আলবার্ট স্কুলের রেক্টর পদে পুনঃ যোগদান করিবার জন্য। তিনি পাণ্ডিত্যে অতুলনীয় ছিলেন—লিখিতেনও অতি চমৎকার। প্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান মিরর ইংরেজী দৈনিকপত্রের তিনি ছিলেন অন্যতর সম্পাদক। আলবার্ট হল তখন কেবল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহারই নীচ তলায় স্কুল বসিত। এই হলের রিডিং রুমে সমসাময়িক সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্রই রক্ষিত হইত—ক্লাস বসিবার এক ঘণ্টা পূর্বে এখানে যাইয়া প্রফুল্লচন্দ্র সেগুলি যত্ন করিয়া পড়িতেন। কৃষ্ণবিহারীর অধ্যাপনাগুণে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রফুল্লচন্দ্রের অন্তরে এই সময়েই সঞ্চারিত হইল। সাধারণ ইংরেজীর মাষ্টাররা যেমন শব্দগুলির প্রতিশব্দ বসাইয়া ও দুই একটী গ্রামারের জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া পড়ানো শেষ করেন—কৃষ্ণবিহারী তাহা করিতেন না। তিনি সাহিত্য পড়াইতে বসিয়া সাহিত্য রসেরই সৃষ্টি করিতে পারিতেন এবং বহু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করিয়া পাঠ্যকে সরল ও সহজবোধ্য করিয়া তুলিতেন।

ক্রমে এই স্কুল হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিলেন ও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। বৃত্তির তালিকায় তাঁহার নাম না দেখিয়া শিক্ষকেরা নিরাশ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু

প্রফুল্লচন্দ্র নিজে ইহাতে দুঃখিত হন নাই। সত্যকার মেধাবী ছাত্রেরাই যে সব সময়ে পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে—তাহা তিনি স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে যাহারা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে, তাহারা যে পরবর্ত্তী জীবনে অনেকেই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে না—ইহাই সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয়। যাঁহারা জীবনযুদ্ধে জয়ী হন, তাঁহারা অনেকেই ছাত্রজীবনে উচ্চশ্রেণীর কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই—ইহা বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়।

এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে রায় পরিবারে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। হরিশচন্দ্রের আর্থিক অবস্থার দারুণ অবনতি হইল। তিনি তেজারতিতে নিজের ও অপরের অনেক টাকা খাটাইতেন—তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত টাকা মারা পড়িল। সমস্ত ঋণ আসিয়া পড়িল হরিশ-চন্দ্রের মাথায়। তিনি অতিশয় সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্ত্রীর অলঙ্কার ও তালুকের মহাল বিক্রয় করিয়া তিনি ঋণ শোধ করিতে লাগিলেন। এ সময়ে আর সমস্ত পরিবারের পক্ষে কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকা সম্ভব বিবেচিত হইল না। হরিশচন্দ্র সস্ত্রীক রাড়ুলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—প্রফুল্লচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতৃগণ বাসাবাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন।

এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এইবার প্রফুল্ল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজে প্রবেশলাভ করিলেন। এই

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

কলেজের ছাত্র বেতন ছিল মাত্র ৩৲। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কলেজকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও নিজেদের জিনিষ মনে করিয়াই প্রফুল্ল এখানে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার নিজেরই উক্তি। এখানে ইংরেজী গদ্য পড়াইতেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইংরেজী পদ্য পড়াইবার ভার ছিল, প্রসন্নকুমার লাহিড়ীর উপর। লাহিড়ী মহাশয় ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের সুপ্রসিদ্ধ সেক্সপীয়ার-অধ্যাপক টনী সাহেবের প্রিয় ছাত্র। সুরেন্দ্রনাথের অধ্যাপনার পরিচয় সেকালে সারা বাংলার ছাত্র সমাজের জানা ছিল। তাঁহার 'বার্ক' ও 'ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশান' পড়ানো ছাত্রগণ মুগ্ধ হইয়া শুনিত। উহা ছিল যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিষ্ট্রী ক্লাসে যোগ দিতেন, কারণ কেমিষ্ট্রী তখন এফ, এ পরীক্ষায় অবশ্যপাঠ্য ছিল। ক্রমে কেমিষ্ট্রীই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাঠ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে। ক্লাসে যে সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরীক্ষা চলিত, তাহাতে প্রফুল্ল-চন্দ্রের মন উঠিত না। একজন সহপাঠীর সহিত মিলিত হইয়া তাহারই গৃহে প্রফুল্লচন্দ্র নিজস্ব ক্ষুদ্র লেবরেটরী স্থাপন করিলেন ও সেখানে ক্লাসে-পরীক্ষিত প্রক্রিয়াগুলি নিজেরা হাতে-কলমে করিয়া দেখিতেন। একদিন এইভাবে পরীক্ষা চালাইবার সময়ে হাইড্রোজেন টিউবে অক্সিজেন গ্যাস ঢুকিয়া যায়, ও গ্যাসে অগ্নি সংযোগ করায় সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ বিস্ফোরণ ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

পরীক্ষারত প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু অক্ষত ছিলেন। এইসময়ে কলেজে কেমিষ্ট্রীর যে পাঠ্যপুস্তক ছিল, তাহা ছাড়াও কেমিষ্ট্রীর আরও বহু পুস্তক প্রফুল্লচন্দ্র পড়িয়া ফেলেন। কেমিষ্ট্রীর উপর পক্ষপাতিত্ব বশতঃই তিনি বি, এ-তে 'বি' কোর্স গ্রহণ করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে নিজের, চেষ্টায় প্রফুল্লচন্দ্র কিছু লাটিন ও ফ্রেঞ্চ শিক্ষা করিয়াছিলেন। একজন পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি সংস্কৃতও কিছু পড়িয়া ফেলিলেন। এইবার তিনি আশা করিতে লাগিলেন যে, গিলক্রাইষ্ট স্কলারশিপ এগজামিনে তিনি উপস্থিত হইতে পারিবেন। এই পরীক্ষা লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর ম্যট্রি-কুলেশন পরীক্ষার সমকক্ষ—ইহাতে লাটিন, গ্রীক অথবা সংস্কৃত, ফ্রেঞ্চ অথবা জার্মাণ—এই কয়েকটি ভাষার জ্ঞান থাকা দরকার। অতি গোপনে প্রফুল্লচন্দ্র এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ও অবশেষে পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করিলেন। এইবার এই বৃত্তির সাহায্যে তাঁহার ইংলণ্ড যাওয়ার উপায় হইল। তাঁহার পিতা তখন যশোহরে ঋণ শোধের জন্য একটা জমিদারী মহল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ইংলণ্ড গমনে সম্মতি দিলেন। তাঁহার মাতাও সাধারণ রমণী ছিলেন না, কালাপানি পার হইলে জাতি যাইবে—এই ধারণার কোন মূল্যই ছিল না তাঁহার কাছে। তিনিও পুত্রের প্রবাস গমনে আপত্তি করিলেন না। প্রফুল্লচন্দ্র বিলাত-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

দুই

কলিকাতা হইতে কালিফোর্ণিয়া জাহাজে প্রফুল্লচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। সঙ্গী ছিলেন ডাক্তার পি, কে, রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ—ইনি ডাক্তারী পড়িবার জন্য যাইতেছিলেন। ৪০০৲ টাকায় প্রথম শ্রেণীর সেলুনের টিকিট কিনিয়াছিলেন তিনি, কাজেই জাহাজে ভিড়ের কষ্ট তাঁহাকে ভুগিতে হয় নাই —অবশ্য জাহাজে যাত্রীবাহুল্য ছিলও না। কিন্তু সমুদ্র-পীড়ায় প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। জাহাজ দুলিতে আরম্ভ করিলেই তাঁহার বমনোদ্রেক হইত—তিনি দাঁড়াইতে পারিতেন না—সর্বপ্রকারে অসুস্থ বোধ করিতেন।

৩৩ দিন পথে কাটাইবার পর অবশেষে জাহাজ গ্রাভেসেণ্ড বন্দরে ভিড়িল। সেখান হইতে লণ্ডনের ফেন চার্চ ষ্ট্রীট ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিবা মাত্র জগদীশচন্দ্র বোস ও সত্যরঞ্জন দাশ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ও দ্বারকানাথ তাঁহাদের সহিত এক সপ্তাহ কাটাইয়া টাওয়ার অফ্ লণ্ডন প্রভৃতি অনেক দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইলেন। সত্যপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) ও তদীয় ভ্রাতা--তাঁহাদিগকে সব কিছু দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রিজেণ্ট পার্কের নিকট গ্লষ্টার রোডে এক বাসাবাড়ীতে সামান্য কিছুদিন কাটাইয়া প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা যাত্রা করিলেন

—সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেই তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন। এডিনবরা লণ্ডনের চারিশত মাইল উত্তরে—লণ্ডন অপেক্ষা শীত এখানে অনেক বেশী। লণ্ডনের বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন—বেশ কিছু গরম কাপড় লণ্ডন হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে। প্রফুল্লচন্দ্র ইংরেজদের প্রিয় টেইল-কোট পরিধান করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। তাহার পরিবর্ত্তে তিনি চোগা চাপকান তৈয়ারী করাইয়া লইলেন। তৈয়ারী হওয়ার পরে গায়ে দিয়া দেখা গেল, জামাগুলি ঢিলা হইয়া রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সাহেব দর্জি বলিল—"আপনি এত রোগা যে গায়ে তুলার প্যাড না জড়াইলে কোন জামা আপনার গায়ে বসিবে না।"

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা পৌঁছিলেন। শীতকালীন সেসন আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিন তখনও বাকী ছিল। এখানে লণ্ডনের মত অত ধোঁয়া নাই, রাস্তায় যানবাহনের অত বাহুল্য নাই। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতি মনোহর, সমুদ্রও নিকটে। আর্থারের সিটের অতি কাছেই ময়দানের পার্শ্বে প্রফুল্লচন্দ্র বাসা লইলেন। একখানি আসবাব সমেত বসিবার ঘর ও শয়নকক্ষ তখনকার দিনে সাপ্তাহিক ১২॥০ শিলিং ভাড়াতেই পাওয়া যাইত। কয়লার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইত না। অনেক বাসাবাড়ীতে সকালবেলায় বিনামূল্যে প্রাতরাশও দিত। প্রফুল্লচন্দ্রের বাসার

যিনি অধিকারিণী ছিলেন, সেই মহিলার সাধুতার খুবই প্রশংসা করিতেন প্রফুল্লচন্দ্র। তিনিও ঐ বাসার পিছনের অংশে বাস করিতেন এবং প্রফুল্লচন্দ্রের সুবিধা অসুবিধার তত্ত্ব লইতেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিয়া ফার্ষ্ট বি, এস-সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। অধ্যয়নের বিষয় লইলেন কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্স্ ও জুওলজী। শীতকালে কোন গাছে পাতা থাকে না ও-দেশে, কাজেই বোটানী পড়ার পক্ষে শীত ঋতু অনুকূল নয়। প্রফুল্লচন্দ্র গ্রীষ্মকালীন সেসনে বোটানী পড়িবেন স্থির করিলেন। কেমিষ্ট্রী ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় বিষয়। ঐ বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন, আলেকজাণ্ডার ক্রাম ব্রাউন। জুনিয়ার ক্লাসে প্রায় ৫০০ ছাত্র। অধ্যাপক ক্লাসে প্রবেশ করা মাত্রই ছাত্রেরা মেজেতে পা ঘসিতে ও দুমদুম শব্দ করিতে থাকে। অবশেষে তিনি বলিয়া ওঠেন —"তোমরা এরূপ করিলে আমি পড়াইব কিরূপে ?" তারপর তাহারা থামিয়া যায়। ক্রাম ব্রাউন ছিলেন অতি ভদ্র— পাণ্ডিত্য ছিল তাঁহার অগাধ, তিনি আবার বহুভাষাবিদও ছিলেন। এমন কি, চীনা ভাষাও তিনি জানিতেন।

লর্ড ইডস্‌লে ছিলেন ইউনিভার্সিটীর লর্ড রেক্টর। তিনি পূর্বে ভারতসচিব ছিলেন। এই সময়ে তিনি ঘোষণা করিলেন যে "India Before and After the Mutiny"—(সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ও পরে ভারতবর্ষ) সম্বন্ধে যে ছাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

প্রবন্ধ রচনা করিবে তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে। প্রফুল্লচন্দ্র ইতিহাস খুব যত্ন করিয়াই পড়িয়াছিলেন—কাজেই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে তিনি ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু দেখিলেন যে বহু পড়াশুনা না করিলে এ প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব নহে। তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সযত্নে দীর্ঘ দিন অধ্যয়নের পরে তিনি যে বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করিলেন, তাহা পুরস্কৃত না হইলেও উচ্চ প্রশংসা লাভ করিল। প্রিন্সিপাল মূর প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অজস্র সুখ্যাতি করিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র নিজ ব্যয়ে প্রবন্ধটা ছাপাইয়া বন্ধু ও মনীষী সমাজে বিতরণ করিলেন। বিখ্যাত পার্লামেণ্ট সভ্য, ভারতবন্ধু ব্রাইটের নিকটও এক কপি পাঠাইলেন। ব্রাইট তদুত্তরে লিখিলেন—"There is an ignorance on the part of the public in this country and great selfishness here and in India as to our true interests in India. The departures from morality and true statesmanship will bring about calamity and perhaps ruin which our children may witness and deplore."

অতঃপর প্রফুল্লচন্দ্র বি, এস, সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ও ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় কেমিষ্ট্রী সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক পাঠ করিয়া ফেলিলেন। লেবরেটারীতে

গবেষণাও পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। শীতপ্রধান দেশে পরিশ্রম করা যায় বেশী—সারাদিন অধ্যয়ন ও গবেষণার পর প্রফুল্লচন্দ্র পদব্রজে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। সমাজে তিনি মিশিতেন কম। কয়েকটী পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাঁহাদের গৃহেই কখনও কখনও যাইতেন।

বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এইবার প্রফুল্লচন্দ্র ডক্টর উপাধি লাভের জন্য মৌলিক গবেষণাযুক্ত প্রবন্ধ রচনা করিতে বসিলেন। যথাসময়ে তিনি ডক্টর হইলেন। কিন্তু তখনই দেশে ফিরিয়া আসা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি দেখিলেন এডিনবরায় আরও অন্ততঃ এক বৎসর থাকিয়া অধ্যয়ন ও গবেষণা না করিলে তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এইজন্য তিনি আরও একবৎসর রহিয়া গেলেন। তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গিলক্রাইষ্ট ভাণ্ডার হইতে তাঁহাকে আরও ৫০ পাউণ্ড দেওয়া হইল এবং তিনি হোপ প্রাইজ বৃত্তিও লাভ করিলেন। ইউনিভার্সিটী কেমিক্যাল সোসাইটীর তিনি একজন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। চারিদিকে তাঁহার একটা খ্যাতি জন্মিল।

১৮৮৮ সালের শীতকালে প্রফুল্লচন্দ্র পাঠ শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার বহুদিনের সাধ পূর্ণ করিতে হইবে। স্কট-

ল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশের সৌন্দর্য্য না দেখিয়া ফেরা যায় না। এই প্রদেশের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত।

এ কয়েক বৎসর অধ্যয়নেই কাটিয়াছে। সময়ও হয় নাই, অর্থও ছিল না। বৃত্তির একশত পাউণ্ড ভিন্ন অন্য কোন আয় ছিল না।—তাহাতেই এক বৎসর চালাইতে হইবে। দেশ হইতে কদাচিৎ সামান্য অর্থ যাইত, তাহার উপর তাঁহার নির্ভর করা চলিত না। কাজেই অতিমাত্রায় মিতব্যয়ী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। ভ্রমণের ইচ্ছা বা প্রয়োজন হইলে নিকটবর্ত্তী ক্লাইড নদীর মোহানায় রদ্‌সে বা লামলাসে যাইতেন ; ছুটীর সময়ে ওসকল স্থানে ব্যয় কম। পি, এন, দত্ত নামে এক বাঙ্গালী বন্ধু প্রায়ই তাঁহার সঙ্গী হইতেন। দুইজনের সঞ্চয় একত্র করিয়া অতি সামান্য খরচে তাঁহারা ভ্রমণ করিতেন। রাত্রে অনেক সময়ে এক শয্যায়ই দুই বন্ধু শয়ন করিতেন—ব্যয় সঙ্কোচের জন্য। কিন্তু ব্যয়বহুল স্থান না হইলেও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া রদসে বা লামলাস অনবদ্য ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র এ সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরম তৃপ্তিই লাভ করিতেন। কিন্তু হাইল্যাণ্ড না দেখিয়া ত স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করা চলে না। জীবনের সাধ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে ?

প্রসিদ্ধ লক্ কেট্রিণ দর্শন ও তাহার জলে সন্তরণ করিয়া লক লমণ্ড-প্রান্তে একরাত্রি যাপন করিলেন প্রফুল্লচন্দ্র।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

এইখানে বসিয়াই মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার বিখ্যাত সনেট—"To a Highland Girl" রচনা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম ও গ্লেনকো দর্শন করিয়া তাঁহারা বেন নেভিসে আরোহণ করিলেন। উহা গ্রেটব্রিটেনের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ। তৎপরে ইনভারনেস দর্শন করিয়া তিনি গেলেন কালোডেন মুরের যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে। তৎপরে ফিরিয়া আসিলেন এডিনবরায়। এইবারে বিদায়ের পালা। অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউন ও প্রিন্সিপাল সার উইলিয়ম মুর তঁহাকে প্রশংসাপত্র দিলেন। তাঁহারা প্রফুল্লচন্দ্রের চাকুরীর ব্যবস্থা করিবার জন্য লর্ড প্লেফেয়ার ও সার চার্লস বার্ণার্ড-এর কাছে পত্রও লিখিলেন।

ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ইঁহারা ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে প্রফুল্লচন্দ্রের নিয়োগের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। ভারতসচিব লর্ড ক্রসের নিকট পর্য্যন্ত সুপারিশ হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উচ্চতম সরকারী শিক্ষাবিভাগে তখন ভারতীয় নিয়োগ একরূপ নিষিদ্ধই ছিল। দুইমাস কাল প্রফুল্লচন্দ্র চাকুরীর আশায় লণ্ডনে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে হতাশ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে তিনি স্বদেশ যাত্রা করিলেন। গিলক্রাইষ্ট ভাণ্ডার তাঁহার গৃহগমনের ব্যয় ৫০ পাউণ্ড দিল—টিকিটের দাম লাগিল ৩৭ পাউণ্ড। বাকী ১৩ পাউণ্ড সম্বল লইয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। ইউরোপের কোন স্থান দর্শন এতদিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে

নাই। সেই জন্য ট্রেণ হইতে মাঝে মাঝে নামিয়া তিনি প্রধান প্রধান সহর ও বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় বস্তুগুলি এক এক পলক দেখিয়া লইতে লাগিলেন। এইভাবে প্যারী নগরী, আল্পস্ পর্ব্বত, পিসার **Leaning Tower,** রোম ইত্যাদি দেখিয়া তিনি ব্রিণ্ডিসি যাত্রা করিলেন জাহাজে উঠিবার জন্য। তিনি যে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আসতেছিলেন—জানিতে পারা গেল যে তাহা তাঁহাকে জাহাজ ধরাইতে পারিবে না। কাজেই বাধ্য হইয়া অতিরিক্ত ৩ পাউণ্ড ভাড়া দিয়া তিনি মেল ট্রেণে ব্রিণ্ডিসি পৌঁছিলেন। জাহাজ পাওয়া গেল—এবং ছয় বৎসর পরে ১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে, মাত্র কয়েকটি শিলিং পকেটে লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় পৌঁছিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

তিন

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই প্রফুল্লচন্দ্র জাহাজের পার্সারের নিকট ৮৲ ধার করিলেন—জামিন স্বরূপ তাঁহার জিনিষপত্র জাহাজের কেবিনেই রহিল। তারপর সহরে ঢুকিয়াই এক বন্ধুর নিকট একখানা ধুতি ও একখানা চাদর ধার করিয়া বিদেশী পোষাক বর্জ্জন করিলেন। দুই এক দিন কলিকাতায় থাকিবার পরই তিনি রাড়ুলিতে রওনা হইলেন। নিজের আসিবার খবর তিনি ইতিপূর্ব্বে বাড়ীতে কাহাকেও জানান নাই—তাঁহার এই ভয় ছিল যে হয়ত বাড়ীর সকলে তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য কলিকাতা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া অকারণ খানিকটা অর্থ অপব্যয় করিয়া বসিবেন। বিলাত-যাত্রার সময়েই তিনি দেখিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার পিতা আর্থিক কষ্টে পতিত হইয়াছেন। প্রবাসকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত যে পত্রব্যবহার হইত, তাহাতে প্রফুল্লচন্দ্রের ধারণা জন্মিয়াছিল যে সে অর্থকৃচ্ছ্রতা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছে।

এই প্রথম প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেলপথে ভ্রমণ করিলেন। এই রেল সংপ্রতি খোলা হইয়াছিল--বিলাত যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি দেখিয়া

গিয়াছিলেন যে প্রস্তাবিত ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মাপ জোঁক হইতেছে। বলা বাহুল্য যে তৎপূর্ব্বে রাড়ুলি হইতে কলিকাতা তাঁহারা বরাবর নৌকাপথেই আসিয়াছেন।

গৃহে পৌঁছিয়াই প্রফুল্লচন্দ্র শুনিলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী আর নাই। তখন তাঁহার মনে পড়িল যে এডিনবরায় একদিন তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার ভগ্নীর মৃত্যু হইয়াছে ও তাঁহার জননী সাশ্রুনেত্রে তাঁহাকে সেই দুঃসংবাদ শুনাইতেছেন। তারিখটী তিনি লিখিয়া রাখেন নাই—রাখিলে বুঝা যাইত যে ঠিক ভগ্নীর মৃত্যুদিবসেই তিনি স্বপ্নটী দেখিয়াছিলেন কিনা।

স্বগ্রামে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও বন্ধু অমূল্যচরণ বসু এম, বি'র গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এই অমূল্যচরণ পরে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাঁহার দক্ষিণহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে কর্ম্মলাভের আশায় তিনি নিরাশ হইয়াই আসিয়াছিলেন। এবারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে কোন অধ্যাপকের পদের জন্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি ক্রফ্‌ট্ ও পেডলার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। ক্রফট্ ছিলেন ডিরেক্টার ও পেডলার প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক। দার্জ্জিলিং গিয়া তিনি ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলীর সহিতও দেখা করিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

তখন রীতিমত কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপনা একমাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজেই হইত। প্রাইভেট কলেজ তখন অল্প কয়েকটীই ছিল এবং বিজ্ঞানবিভাগের আসবাবপত্র সংগ্রহ করার মত অর্থসামর্থ্য তাহাদের কাহারোই ছিল না। এই সব প্রাইভেট কলেজের ছাত্ররা অবশ্য সামান্য বেতন দিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিষ্ট্রী ক্লাসের লেকচার শুনিতে পারিত। প্রফুল্লচন্দ্রও স্বয়ং এই ভাবেই প্রেসিডেন্সীতে কেমিষ্ট্রী পড়িয়াছিলেন।

যাহা হউক—বিজ্ঞানশিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল এবং প্রেসিডেন্সীতে বিজ্ঞানের অন্য একজন অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বেই পেডলার সাহেব ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের নিকট পেশ করিয়াছিলেন। এই সন্ধিক্ষণেই প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—অধ্যাপক পদের প্রার্থী হইয়া।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে ভারতীয়গণের প্রবেশ কার্য্যতঃ একরূপ নিষিদ্ধই ছিল। যদিও অত্যধিক সুপারিশের জোরে কেহ চাকুরী পাইতেন, তাঁহাকে উচ্চতর গ্রেডের দুই তৃতীয়াংশ মাত্র বেতন দেওয়া হইত। জগদীশচন্দ্র বসু প্রফুল্লচন্দ্রের তিন বৎসর পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন—ছাত্রজীবনে তাঁহার কৃতিত্বও দেখা গিয়াছিল অসাধারণ। কিন্তু তথাপি উচ্চতর বিভাগে কর্ম্মলাভ করিতে তাঁহাকে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

কষ্ট পাইতে হইয়াছিল প্রচুর। এবং অবশেষে তাঁহাকে ঐ তুই-তৃতীয়াংশ বেতনের সর্ত্তে রাজী হইয়াই কর্ম্ম পাইতে হইয়াছিল।

অবশেষে ভারতীয়গণের ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে বড়লাট পাবলিক সার্ভিস কমিশন বসাইয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের মত চাহিলেন। উক্ত ক.মশন একটা রফা নিষ্পত্তির চেষ্টায় এই স্থপারিশ করিলেন যে উচ্চতর শিক্ষাবিভাগকে— ইম্পিরিয়াল ও প্রভিন্সিয়াল (সাম্রাজ্যিক ও প্রাদেশিক) এই তুই ভাগে ভাগ করা হউক। প্রথম শ্রেণী সাহেবদের জন্য ও দ্বিতীয়টী ভারতীয়দের জন্যই প্রধানতঃ নির্দ্দিষ্ট রহিল। ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের বেতনাদি প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের প্রায় দ্বিগুণ হইল।

প্রায় এক বৎসর বেকার থাকিয়া প্রফুল্লচন্দ্র জগদীশচন্দ্র বসুর গৃহে তাঁহার ও তদীয় পত্নীর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। অবশেষে প্রেসিডেন্সী কলেজে একজন অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপকের পদ মঞ্জুর হইয়া আসিল ও ২৫০৲ বেতনে প্রফুল্লচন্দ্র ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। বেতনের স্বল্পতা সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিবাদ করায় ডিরেক্টার ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব উত্তর দিলেন—"পছন্দ না হয়, অন্য চেষ্টা দেখুন!"

১৮৮৯ সালের জুলাই মাসে প্রফুল্লচন্দ্র কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে যেখানে পুরাতন হেয়ার স্কুল অধিষ্ঠিত ছিল, এখন সেই স্থানেই কেমিষ্ট্রী বিভাগের অধ্যাপনার বন্দোবস্ত হইল এবং

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

দৈবক্রমে, গৃহের যে স্থানটায় প্রফুল্লচন্দ্র চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররূপে বেঞ্চে উপবেশন করিতেন, সেই স্থানেই এখন তাঁহার অধ্যাপকের চেয়ার পড়িল।

কেমিষ্ট্রী অধ্যাপকের পক্ষে হাতে কলমে এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা দেখাইতে পারা অত্যাবশ্যক। অনেক অধ্যাপক এ বিষয়ে রীতিমত অজ্ঞ। প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াই বুঝিলেন এ বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে না পারিলে অধ্যাপকত্ব করা বৃথা। পুঁথিগত বিদ্যা যতই থাকুক, শুধু বক্তৃতায় ছাত্রগণকে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার বোঝানো সহজ নহে। পেড্‌লার সাহেব নিজে এ বিষয়ে রীতিমত দক্ষ ছিলেন। তিনি দুই একজন সহকারীও প্রস্তুত করিয়াছিলেন অতি উত্তমরূপে। চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী তাহার একজন। প্রফুল্লচন্দ্র অভিমান ত্যাগ করিয়া চন্দ্রভূষণের নিকট এই এক্সপেরিমেণ্ট শিখিতে লাগিলেন। পেড্‌লারও সময়ে সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। তিন মাস শিক্ষানবীশির পর প্রফুল্লচন্দ্র এক্সপেরিমেণ্টে পাকা হইয়া উঠিলেন।

১৮৯১ সালের সেসন আরম্ভ হইতে না হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র অনিদ্রারোগে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কোনক্রমে কয়েক মাস কাটাইয়া পূজার ছুটিতে তিনি দেওঘরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গমন করিলেন। এখানে এক ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে তাঁহার বাসস্থান জুটিল। তখন দেওঘরে ভাল বাড়ী পাওয়া যাইত না।
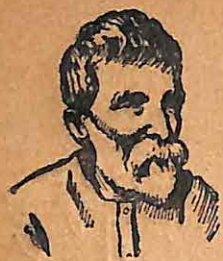
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

রাজনারায়ণ বসু তখন দেওঘরে বাস করিতেছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশির কুমারও ছিলেন। দেওঘর স্কুলের হেডমাষ্টার যোগেন্দ্রনাথ বসুর সহিতও পরিচয় হইল। তিনি তখন মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত লিখিতেছিলেন। মাঝে মাঝে পাণ্ডুলিপি হইতে প্রফুল্লচন্দ্রকে পড়িয়া শুনাইতেন। হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ও এই সময় এখানে আসিলেন। সকলে মিলিয়া আনন্দে দিন কাটিল।

পূজার ছুটির পরেই কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি ৯১নং আপার সার্কুলার রোডে বাস করিতে থাকিলেন। এই গৃহে তিনি পঁচিশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ও এইখানেই বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল।

এই সময়ে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের স্বল্পতার দিকে প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই অভাব দূরীকরণের জন্য তিনি সরল ভাষায় প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী বৈজ্ঞানিক পুস্তিকা রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। প্রাণীবিদ্যার বই-ই প্রথম লিখিতে বসিলেন। এডিনবরায় বি, এস, সি পড়িবার সময়ে তাঁহাকে জুওলোজী অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। এখন আরও বহু পড়াশুনা করিয়া, অবশেষে তিনি একখানি পুস্তক সম্পূর্ণ করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে মৃত জন্তুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়াও দেখিতে হইত। এই বিষয়ে ডাক্তার

নীলরতন সরকার ও প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য তাঁহার সহযোগিতা করিতেন।

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র, নীলরতন ও প্রাণকৃষ্ণের চেষ্টায় একটী Nature Club (নেচার ক্লাব) প্রতিষ্ঠিত হয়। জুওলজিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রামব্রহ্ম সান্যাল, অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্র, ডাক্তার বিপিন সরকারও ইহার সভ্য ছিলেন। মাসে একবার করিয়া ক্লাবের অধিবেশন হইত।

গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী গিয়া প্রফুল্লচন্দ্র কয়েকটী কেউটে সাপ ধরিয়াছিলেন ও তাহাদের বিষদাঁত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফেয়ার প্রণীত Thantophidia পুস্তকের সর্পদংশন অধ্যায়ের বর্ণনার সত্যতা পরীক্ষা করিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

চার

প্রফুল্লচন্দ্রের স্বগ্রামবাসী যাদবচন্দ্র মিত্র আলিপুর কোর্টে মোক্তারী করিতেন। তিনি কি খেয়ালের বশে সালফিউরিক এসিডের ক্ষুদ্র একটী কারখানা ক্রয় করিয়াছিলেন। কারখানা ছিল সোদপুরে। চারিদিকে বাঁশঝাড়। মিত্র কার-খানা দেখাইতে প্রফুল্লচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। প্রফুল্লচন্দ্র সহকর্ম্মী চন্দ্রভূষণ ভাতুড়ীকে ও তদীয় সহোদর কুলভূষণকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন কারখানা দেখিতে। কুলভূষণ কেমিষ্ট্রীর এম, এ ও গোল্ড মেডালিষ্ট। এসিডের কারখানাটী অবশেষে ১০০০৲ মূল্যে যাদব মিত্র প্রফুল্লচন্দ্রকে বিক্রয় করিলেন। অতি সামান্য আয়োজন, যে ভাবে চলিতেছিল—সে ভাবে চালাইলে তাহা কোনদিন লাভজনক ব্যবসায়ে দাঁড়াইতে পারে না। সেইজন্য ক্রয় করিয়াই ইহার উন্নতির জন্য প্রফুল্লচন্দ্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। কাজ চালাইবার ভার আপাততঃ দেওয়া হইল ভাতুড়ী ভ্রাতৃ-দ্বয়ের উপরে। গ্রীষ্মের ছুটী আসিল—তিনমাস কলেজ ছুটী। এই সময়টা তাঁহারা সোদপুরের বাঁশঝাড়ে অবস্থান করিয়া এসিড-কারখানা চালাইবেন, প্রফুল্লচন্দ্র নিজে মাঝে মাঝে যাইয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিবেন—এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

সেখানে থাকার জায়গা মিলিল এক মেটে কুঁড়ে ঘর। বাজার দোকান কিছুই নিকটে নাই। বস্তা ভরিয়া চাউল ও আলু লইয়া ভাদুড়ীরা বনবাসে গমন করিলেন ও বাঁশঝাড়ের ভিতর নিত্য পরমানন্দে বনভোজন করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কয়েকমাস কাটাইয়া ছুটির শেষে তাঁহারা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাদের নিকট এই মত পাওয়া গেল যে কারখানা ও-ভাবে চালাইয়া কোন ফল হইবে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কারখানা নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। সে অর্থ এখন কোথায়? কাজেই ব্যবসাটী মাঠে মারা গেল। বহু অর্থ ক্ষতি করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র লাভ করিলেন—কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

এই সময়ে একে একে কয়েকটি বাজার-চলতি ঔষধ ও সিরাপ প্রস্তুত করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বেঙ্গল কেমিক্যালের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বৌবাজারের ফুটপাথ হইতে শিশি বোতল কিনিয়া স্বহস্ত-প্রস্তুত সিরাপ রীতিমত বিলাতী কায়দায় লেবেল করিয়া তিনি বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বগ্রামবাসী এক যুবক বাজারে যাওয়ার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত জিনিষের কাটতি মোটেই হইত না। দোকানদারেরা জিনিষের প্রশংসা করিল বটে, কিন্তু ক্রয় করিল না। বলিল—"লোকে বিলাতী জিনিষই পছন্দ করে, দেশী জিনিষ কেহ লইতে চাহে না।"

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমূল্যচরণ বসু একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বাহিরের ঘরে যেখানে ঔষধ প্রস্তুত হয়—প্রফুল্লচন্দ্র তখনই তাঁহাকে সেইখানে লইয়া গিয়া সব কিছুই দেখাইলেন। অমূল্যচরণের আনন্দ দেখে কে? তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন—একাজে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিবেন। তিনি ইতিমধ্যে ডাক্তারীতে বেশ পশার করিয়াছিলেন—কাজেই ডাক্তার মহলে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার চেষ্টায় কতিপয় ডাক্তার বেঙ্গল কেমিক্যালের ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন—বাজারে ক্রমে প্রফুল্লচন্দ্রের কারখানার জিনিষ সুপরিচিত হইয়া উঠিল। অমূল্যবাবুর আগমনে কারখানার আরও একদিক দিয়া প্রচুর সুবিধা হইল—তিনি নগদ কিছু অর্থ কারখানায় ফেলিলেন। কাজেই সমস্ত কাজ অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খলভাবে ও উন্নত প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে বাজারে বেঙ্গল কেমিক্যালের মাল একটু একটু আদর লাভ করিতে লাগিল। যে সব দোকানদার প্রথম প্রথম শুধু উপহাস করিয়াছিল—তাহারা এখন অল্প অল্প জিনিষ চাহিয়া লইতে লাগিল। অমূল্যচরণের চেষ্টায় ডাক্তারেরা বেঙ্গল কেমিক্যালের টনিক সিরাপ, সিরাপ অফ্ হাইপোফসফাইট অব লাইম প্রভৃতি রোগীদের জন্য

ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এই সব ডাক্তারদের মধ্যে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, সুরেশ সর্ব্বাধিকারী, নীলরতন সরকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চোরেই চোর ধরিতে পারে; নিজে ডাক্তার বলিয়াই অমূল্যচরণ এই সব ডাক্তারকে হাত করিতে পারিয়াছিলেন। অমূল্যচরণ ও রাধাগোবিন্দের মন্ত্রণায় প্রফুল্লচন্দ্র এইবার কালমেঘ, কুরচি, বাসক প্রভৃতির নির্য্যাস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন—বাজারে তাহা আদরও পাইল। বটকৃষ্ট পাল কোম্পানী যেদিন এক হন্দর সিরাপ ফেরী-আইওডাইড ও এক হন্দর ফেরী-সাল্‌ফের অর্ডার দিলেন, সেদিন প্রফুল্লচন্দ্রের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এইবার কিন্তু পর পর দুইটী দারুণ দুর্ঘটনায় প্রফুল্লচন্দ্রের মনেও যেরূপ দারুণ আঘাত লাগিল—বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্রমোন্নতিও তেমনি সাময়িকভাবে ব্যাহত হইল। অমূল্যচরণের ভগ্নীপতি সতীশচন্দ্রও এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি কেমিষ্ট্রীর এম, এ ছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজে উৎসাহ ও অর্থ দুইই তিনি প্রদান করিয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনি। এই সময়ে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড দৈবাৎ তাঁহার উদরস্থ হওয়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—এবং ইহারই কিছুদিন পরে প্লেগ রোগে অমূল্যচরণেরও মৃত্যু ঘটিল। প্রফুল্লচন্দ্র একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন!

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

একক, নিঃসহায় প্রফুল্লচন্দ্র অকুতোভয়ে দৃঢ় অধ্যবসায়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের উন্নতির জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাহারই ফলে পাঁচ বৎসর পরে ইহাকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব হইল ও মাণিকতলার খালের পরপারে ১৩ একর ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় সুবিস্তীর্ণ কারখানা স্থাপিত হইল। পরবর্ত্তী সময়ে পাণিহাটীতে আরও ৫০ একর জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে ও তথায় আরও একটী শাখা কারখানা স্থাপিত হইয়া বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্রমোন্নতি ও প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনার সিদ্ধি ঘোষণা করিতেছে। এখানে ২০০০ শ্রমিক কাজ করে। এখানে প্রতিষ্ঠিত সাল-ফিউরিক এসিড-যন্ত্রের মত এত বৃহৎ যন্ত্র ভারতে আর কুত্রাপি নাই। স্যার জন কামিং লিখিয়াছেন :—

"The Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd, is one of the most go-ahead young enterprises in Bengal. Dr. Prafulla Chandra Ray D. Sc. F. c. s. started it as a small private cencern in Upper Circular Road about 15 years ago and made drugs from indigenous materials. About six years ago, it was made into a limited liability company with a capital of two lakhs, Many of the leading chemists in Calcutta are share-

holders. It is now a well-thought-out and well-managed factory with about 70 workmen, at 90 Manictolla Main Road, Babu Rajshekhar Bosu, the manager, is an M. A. in Chemistry. The variety of manufactures of laboratory apparatus, which requires skilled craftsmen in wood and metal, has been taken up. The latest developement is in perfumes. The enterprise shows signs of resourcefulness and business capacity, which should be an object lesson to capitalists of this province.

"Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal in 1908."

এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্ট একটী নীচু একতালা গৃহে অবস্থিত ছিল। বায়ু চলাচলের ভাল ব্যবস্থাও তাহাতে ছিল না। এক্সপেরিমেণ্টের সময়ে সমস্ত গৃহখানি গ্যাসে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। ইহাতে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র একদিন প্রিন্সিপাল টনী সাহেবকে ডাকিয়া আনিয়া ধূমাচ্ছন্ন গৃহের দুরবস্থা দেখাইলেন। প্রিন্সিপাল দুই মিনিট সেখানে দাঁড়াইবার পরই শ্বাসকষ্ট বোধ করিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া

গেলেন ও তৎক্ষণাৎ ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনকে চিঠি লিখিলেন যে কেমিষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্টের জন্য স্বাস্থ্যকর নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। তিনি আরও লিখিলেন যে হেল্‌থ্ অফিসার যদি বর্ত্তমান কেমিষ্ট্রী গৃহের অবস্থার কথা জানিতে পারেন, তবে তিনি সম্ভবতঃ কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইবার অপরাধে আদালতে অভি-যুক্ত করিবেন।

টনী সাহেবের আবেদনের ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। অবিলম্বে নূতন ভাবে ইউরোপের উন্নত ল্যাবরেটরী সমূহের আদর্শে প্রেসিডেন্সী কলেজের নূতন কেমিষ্ট্রী ল্যাবরেটরী গৃহ নির্ম্মিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়—এই সময়েই প্রফুল্ল-চন্দ্রের মৌলিক গবেষণা সমূহও এই সময় হইতেই সমগ্র পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার Mercurous Nitrik. প্রফুল্লচন্দ্র নিজে ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Having recently had occasion to prepare Mercurous Nitrate in quantity by the action of dilute acid in the cold on mereury, I was rather struck by the appearance of a yellow crystalline deposit. At first sight it was taken to be a basic salt, but the formation of such a salt in a strongly acid solution was contrary

to ordinary experience. A preliminary test proved it, however, to be at once a mercurous salt as well as a nitrate. The interesting compound promised thus amply to repay an investigation".

মারকুরিয়াস নাইট্রাইটের আবিষ্কার সর্ব্বপ্রথম প্রফুল্লচন্দ্রকে পরিচিত করিল—রসায়ন বিদ্যার একজন মৌলিক আবিষ্কারক রূপে। দেশ বিদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অভিনন্দন পাঠাইতে লাগিলেন। রস্‌কো, ডইভার্স, বার্থেলো, ভিক্টর মেয়ার, ডলার্ড প্রমুখ মনীষীগণের নিকট হইতে অজস্র প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র আরও নূতন নূতন আবিষ্কারের পথে প্রত্যহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একভাগ অধ্যয়নের জন্য, এক ভাগ লেবরেটরীর জন্য ও তৃতীয় ভাগ বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সন্ধ্যাবেলায় তিনি পড়াশুনা করিতে পারিতেন না, করিলেই রাত্রে আর একেবারেই নিদ্রা হইত না। তাঁহার নীতি ছিল—"Early to bed and early to rise."

এই ভাবে সময় ভাগ করিয়া লওয়ায় তাঁহার সমস্ত কাজেরই সুবিধা হইয়াছিল ও তিনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—"History of Hindu Chemistry" রচনার সময়

করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার প্রেরণা লাভ করেন তিনি ফরাসী কেমিষ্ট বার্থেলোর নিকট হইতে। ঐ পৃথিবীবিখ্যাত পণ্ডিত সীরিয়াক আলকেমী, আরেবিক আলকেমী ও মধ্য যুগীয় আলকেমী নামে তিনখানি অতি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মার্কুরিয়স নাইট্রাইট আবিষ্কারের পর প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত তাঁহার কিছু পত্র ব্যবহার হয়। প্রফুল্লচন্দ্র "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" পুস্তকের একটী সংক্ষিপ্তসার ইংরেজীতে লিখিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করেন—তাঁহারই অনুরোধে। প্রতিদানে তিনি স্বরচিত উক্ত তিনখানি বৃহৎ আলকেমী গ্রন্থ প্রফুল্লচন্দ্রকে উপহার পাঠান। ইহা দেখিয়া ও পাঠ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের বাসনা হইল—হিন্দু কেমিষ্ট্রী সম্বন্ধে অনুরূপ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার। বার্থেলো ফ্রান্সের "জর্ণাল ডি স্যাভাণ্টস্"-এ একটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে Savant বা সত্যদ্রষ্টা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহা যে প্রফুল্লচন্দ্রের অন্তরে কত উদ্দীপনার সঞ্চার করিল, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কেমিষ্ট্রী রচনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এজন্য তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল পর্ব্বতপ্রমাণ পুঁথি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মুদ্রিত ও হস্তলিখিত—অর্দ্ধবিস্মৃত ও বিস্মৃত জীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথিসকল বহু আয়াসে ও প্রভূত অর্থব্যয়ে আনাইয়া তাহাদের পাঠোদ্ধার করা সহজ কাজ

ছিল না। এইভাবেই প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন ভারতে হিন্দুগণের ভিতর রসায়ন-শাস্ত্রের চর্চ্চা কোন্ স্তরে উঠিয়াছিল তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৯১২ সালে ডারহাম ইউনিভার্সিটী হইতে প্রফুল্লচন্দ্রকে ডি-এস,সি উপাধি দেওয়া হয়। ঐ উপলক্ষে ডাইস-চ্যান্সেলার যে বক্তৃতা দেন—তাহাতে তিনি History of Hindu Chemistryর উল্লেখ ও উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ করেন। তিনি বলেন—

"A keen and successful investigator, he has long made his mark by contributions to scientific periodicals, both English and German, but his famc chiefly rests on his monumental History of Hindu Chemistry, a work of which both the scientific and linguistic attainments are equally remarkable, and of which of any book, we may pronounce that it is definitive.

History of Hindu Chemistry লিখিতে বসিয়া প্রফুল্লচন্দ্রকে কয়েক বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অধ্যয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় সমস্তই এই রচনার কার্য্যে ব্যয়িত হইত। কলেজ-ল্যাবরেটরীর কাজ বা বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজের ক্ষতি হইত না—কিন্তু তাঁহার নিজের

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

অধ্যয়ন—অর্থাৎ আধুনিক রসায়নসাহিত্যের অনুশীলনের সময় হইত না। ইহার পরিণাম এই হইল যে সমসাময়িক নব-নব প্রচেষ্টা ও আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন থাকিতে পারিতেন না। কেমিষ্ট্রীর নানা বিভাগে নিত্য নূতন আবিষ্কার জগৎকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল—কিন্তু তখন প্রফুল্লচন্দ্র হিন্দু কেমিষ্ট্রীর ধ্যানে নিমগ্ন। সে ধ্যান যখন ভাঙ্গিল, তখন দেখিলেন রাসায়নিক পৃথিবী অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—তাহার নাগাল ধরিতে হইলে এখন বেশ কিছুদিন হিন্দু কেমিষ্ট্রী রচনা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সমসাময়িক রসায়ন সাহিত্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। এই কারণেই হিন্দু কেমিষ্ট্রীর দ্বিতীয় ভাগ রচনায় প্রফুল্লচন্দ্র অবিলম্বে হাত দিতে পারিলেন না। তাঁহাকে দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করিতে হইল।

এই সময়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় ও সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র দ্বিতীয়বার ইউরোপ গমনের বাসনা করিলেন। তখন গবর্ণমেণ্টের একটী রীতি ছিল যে এরূপ উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিভাগের কোন অধ্যাপক ইউরোপ গমন করিলে তাঁহার ব্যয়ের আংশিক আনুকূল্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু সাধারণতঃ সে নিয়ম ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের লোকদের উপরই প্রযুক্ত হইত। ইতিপূর্ব্বে জগদীশচন্দ্রও এই নিয়মের সুবিধালাভ

করিয়া ইউরোপ গিয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের বেলায় বিঘ্ন হইল এই যে তিনি ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের লোক নহেন। তথাপি তিনি ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশানকে জানাইলেন যে তিনি ইউরোপ গমনে অভিলাষী। কয়েক মাস পর্য্যন্ত কোন উত্তর আসিল না। অবশেষে বড়লাট দপ্তর হইতে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল যে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের অধ্যাপকগণকে এরূপক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ সুবিধা অর্পিত হইয়া থাকে, প্রফুল্লচন্দ্রকে তৎসমুদয়ই দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য যে ডিরেক্টর পেডলারের সুপারিশেই গবর্ণমেন্টের কঠোর আইনের এরূপ ব্যতিক্রম ঘটা সম্ভব হইয়াছিল।

যাহা হউক ১৯০৪ সালের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা হইতে দ্বিতীয়বার লণ্ডনযাত্রা করিলেন—প্রথম যাত্রার ২২ বৎসর পরে।

লণ্ডনে পৌঁছিয়াই প্রফুল্লচন্দ্র ডেভি-ফ্যারাডে ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করার সুযোগ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এই ল্যাবরেটরীতে ইতিপূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুও গবেষণা করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সার উইলিয়াম র‍্যামজে ও সার জেমস ডেওয়ার প্রমুখ কেমিষ্টগণের সহিত পরিচিত হইলেন। এডিনবরায় যাইয়া তাঁহার কতিপয় পুরাতন বন্ধুর সহিতও দেখা করিলেন। অতঃপর ইংলণ্ডে, হলাণ্ডে, জার্ম্মাণীতে ও ফ্রান্সে অগ্রগণ্য রসায়নবিদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকলের

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

নিকটই সমাদর প্রাপ্ত হইলেন এবং সকলের সহিতই তাঁহার ভাবের আদান প্রদান ঘটিল। যাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা জমিয়াছিল —তাঁহাদের ভিতর বার্থেলো, সিলভাঁ লেভি, ভ্যাণ্টহফ, স্মিথেল্‌স্‌, কোহেন, ডিক্সন, পার্কিন ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডের নাম করা যাইতেপারে।

প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের কাজে প্রবৃত্ত হইতে না হইতে বঙ্গ বিভাগ করিয়া বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালী জাতিকে মর্ম্মাহত করিলেন। এ আঘাত বাঙ্গালীরা নীরবে সহ্য করিল না—ঘোর প্রতিবাদে সমস্ত দেশ মুখর হইয়া উঠিল। প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছেন—"As a government servant, I was precluded from taking any active part in the movement, but from my recess in the laboratory I watched it steadily, and I need scarcely add that my heart went out to it,"

প্রফুল্লচন্দ্র একাগ্রচিত্তে কেমিষ্ট্রীর যে সাধনা করিতে লাগিলেন, তাহা সিদ্ধিলাভ করিল তাঁহার শিষ্যগণের ভিতর। রসিক লাল দত্ত, মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর, মাণিকলাল দে, সত্যেন বোস—ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাগুণে জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। একসময়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"জীবনে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ধনরত্ন চাহি নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—"তোমার কী সম্পদ আছে"—আমি উত্তর দিব—"আমার শিষ্যেরাই আমার সম্পদ।"

১৯১২ সালে লণ্ডনে ইউনিভার্সিটী কংগ্রেস বসে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর প্রতিনিধিরূপে দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সহিত প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রেরণ করা হয়। এবারেও তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া বহু মনীষী কেমিষ্টের সহিত পরিচিত হন। লণ্ডনে থাকিতে থাকিতেই তিনি সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়েই কলিকাতা হইতে সার আশুতোষ মুখার্জ্জী এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে জানান যে শ্রীযুক্ত তারক পালিত ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষের অতুলনীয় বদান্যতায় সংগৃহীত ২১ লক্ষ টাকা দিয়া ইউনিভার্সিটীর সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই কলেজে কেমিষ্ট্রীর চেয়ার গ্রহণ করিবার জন্য আশুতোষ প্রফুল্লচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করেন। বলা বাহুল্য প্রফুল্লচন্দ্র তখনই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া অল্পদিন পরেই তিনি সারা জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সায়েন্স কলেজে যোগদান করিলেন। প্রথম অবস্থায় কলেজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির রীতিমত অভাব ছিল, তাহারই মধ্য দিয়া প্রফুল্লচন্দ্রকে রসায়ন বিভাগের কার্য্য ও গবেষণা চালাইতে হয়। সে আমলে গবর্ণমেণ্ট কোন দিনই সায়েন্স কলেজকে প্রীতির চক্ষে

দেখেন নাই—অর্থ সাহায্যও করেন নাই। তাহার কারণ—এই কলেজের এক নিয়ম আছে যে মাত্র ভারতীয়রাই এখানে অধ্যাপক পদ লাভ করিবে। যেখানে শ্বেতকায়ের প্রভুত্ব নাই, সে প্রতিষ্ঠান শ্বেতাঙ্গ শাসিত গবর্ণমেণ্টের প্রীতি লাভ করিবে কিরূপে ?

সায়েন্স কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময়ে ১৯১৯ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'স্যার' উপাধি উপহার দেন—দিয়া নিজেরাই সম্মানিত হন—বলা যাইতে পারে। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে আবার ইউরোপে প্রেরণ করেন—গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য। তিনি একা যান নাই—একদল ছাত্রও বিশ্ববিদ্যা-লয় কর্ত্তৃক তাঁহার সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই তিনি দেশমাতার অন্যবিধ সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হন। খুলনা জেলা দুর্ভিক্ষের গ্রাসে নিপতিত হয়। ১৯২২ সালে সমগ্র উত্তর বঙ্গ বন্যায় প্লাবিত হইয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রফুল্লচন্দ্র অগ্রণী হইয়া আর্ত্তসেবার জন্য দেশের অধিবাসীগণের আনুকূল্যে অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিলেন। তাহাদের সাহায্যে যথাসম্ভব জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই হইতে জন সেবা তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। এই দুর্ভাগ্য দেশে বন্যা, ঝঞ্চা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, ইত্যাদি—একটার পর একটা লাগিয়াই আছে। প্রতিক্ষেত্রেই প্রফুল্লচন্দ্র দেশসেবায় অগ্রণী হইয়াছেন—তাঁহার জীবনের ব্রত বৈজ্ঞানিক গবেষণা তখন

আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হয় নাই। তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সঙ্কটত্রাণ সমিতি কর্ত্তৃক দেশ ও বিদেশ হইতে সাত লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল ও তাহারই সাহায্যে মৃতাবশেষ নরনারীর কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত চরখা আন্দোলনে দেশ স্বাধীন হইবে, এ বিশ্বাস তাঁহার না থাকিলেও সঙ্কটকালে ইহার দ্বারা কথঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে বুঝিয়া বন্যাদুর্ভিক্ষবিধ্বস্ত অঞ্চলে নরনারীকে তিনি চরখায় সূতা কাটার উপদেশ দেন, এবং এই হইতে তিনি চরখার একজন উৎসাহী সমর্থক হইয়া দাঁড়ান।

রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে যোগ না দিলেও তাঁহার সহানুভূতি যে পূর্ণমাত্রায় জাতীয় আন্দোলনের দিকে ছিল, সে বিষয়ে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবাসীর রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ যখন তাহাদের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতাকে চিরতরে শৃঙ্খলিত করিবার জন্য কুখ্যাত রাউলাট আইন প্রবর্ত্তিত হইল, তখন প্রতিবাদ সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ঘোরতর নিন্দা করিয়া আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বাংলা দেশের যুবকগণ যে জীবনযুদ্ধে পদে পদে পরাজিত হয়, শিল্প বাণিজ্যের প্রতি ক্ষেত্রে যে তাহারা অবাঙ্গালীর প্রতিযোগিতার সম্মুখে হঠিয়া যায়, ইহা ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

গভীরতম মনস্তাপের কারণ। সময়ে অসময়ে যখন তখন সুযোগে দুর্য্যোগে তিনি একভাবে একই উপদেশ দিতেন—"স্বাবলম্বী হও! চাকুরীর মোহ ত্যাগ কর! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লোভ সম্বরণ কর! পয়সা উপার্জ্জন করিবার পন্থা শিল্প ও বাণিজ্য! পয়সা উপার্জ্জন না করিলে কেহ বাঁচে না! পয়সা উপার্জ্জনের জন্য চাই মাত্র সাধুতা ও পরিশ্রম! তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কোন আবশ্যক হয় না!" গভীর মনস্তাপের সহিত তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন—

"The bread problem of the Bengali haa been my obsession during the last forty years, and to my dismay, I have been watching that in the land of his birth he is least able to stand the keen competition which faces him in every field,"

প্রফুল্লচন্দ্র নিজে ব্যবসায়ী ছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ব্যতীত বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন ও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সোদপুর সালফিউরিক ওয়ার্কস, ক্যালকাটা পটারী ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, বঙ্গীয় ষ্টীম নেভিগেসান কোং, জি, সি, রায় এণ্ড ব্রাদার্স—পাবলিসার্স এণ্ড বুকসেলার্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ভিতর

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

প্রথমটি ও শেষটি স্বল্পায়ু হইলেও, অন্যগুলি স্থায়ী ও লাভ জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

স্বল্প বেতনের অধ্যাপক মাত্র হইলেও তাঁহার দান ছিল প্রভূত। বিজ্ঞান কলেজের উন্নতির জন্য তিনি স্যার আশুতোষের হস্তে দশ হাজার টাকা অর্পণ করেন। নিজের গ্রামে ও জেলায় যাহাতে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পায়, তদুদ্দেশ্যেও তিনি দশহাজার টাকা দান করেন। শৈশবে যে বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন, পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত সেই শিক্ষা-মন্দিরে তিনি সারাজীবন নিয়মিত ভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বক্তৃতা প্রদান করিয়া তিনি যখনই যে অর্থলাভ করিয়াছেন, তাহা তখনই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া আসিয়াছেন। বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনাকালে শেষ পাঁচ বৎসরের যে বেতন —সেই সমগ্র ৬০০০০৲ ষাট হাজার টাকাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন।

মহাত্মা গান্ধীর উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের। থাকিবারই কথা! কারণ উভয়েই ছিলেন একই প্রকৃতির লোক, একই ধাতুতে তাঁহাদের হৃদয় গঠিত হইয়াছিল। অনন্য-সাধারণ ত্যাগ তাঁহাদের উভয়েরজীবনকেই করিয়াছিল মহিমাময়। অবশ্য কর্মক্ষেত্র ছিল স্বতন্ত্র। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বৈজ্ঞানিক। কিন্তু দেশ-সেবার ক্ষেত্রে উভয়েরই লক্ষ্য ছিল এক। সে লক্ষ্য হইল জাতিকে স্বাবলম্বী করা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

রাজনীতির বৃহৎ আবর্ত্তের ভিতর হাবুডুবু খাইতে খাইতেও মহাত্মা গান্ধী কোনদিন এক মূহুর্ত্তের জন্যও একথা ঘোষণা করতে ভুলেন নাই যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না করিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন ও অবাস্তব। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপায়রূপে তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন কুটীর শিল্পের অনুশীলন। এবং কুটীর শিল্পের ভিতর সর্বাগ্রগণ্য মর্য্যাদা তিনি দিয়াছিলেন খাদিকে। ইহার উপর এমন অটুট আস্থা ও অতুলনীয় শ্রদ্ধা তাঁহার ছিল যে এমন কথাও তিনি সর্বদাই মুক্তকণ্ঠে বলিতেন যে দেশের লোক সবাই যদি সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে সুরু করে, তাহা হইলেই দেশের স্বাধীনতা অচিরে আসিবে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনয়নের ক্ষমতা খাদির আছে—একথা স্বীকার না করিয়াও প্রফুলচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর খাদি আন্দোলনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহার কারণ ছিল। তিনি জানিতেন যে দেশের কতক লোকও যদি মহাত্মার প্রভাবের বশে বা দেশের স্বাধীনতা আনয়নের উদ্দেশ্যে খাদি বয়নের কার্য্যে উৎসাহী হয়, তাহা হইলে তাহারা অন্ততঃ স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে, এবং কুটীর শিল্পদ্বারাও যে অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভব, তাহা উপলব্ধি করিবে। দারিদ্র্যমোচনই হইল বড় কথা। দেশবাসী যখন দেখিবে যে সুতা কাটিয়াও সংসারযাত্রা নির্বাহ করা যায়, তখন তাহারা শুধু সূতা কাটিয়াই নিবৃত্ত হইবে না, অনেক কিছু অন্যবিধ কুটির শিল্প সাগ্রহে অবলম্বন বা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

আবিষ্কার করিবে। এইভাবে জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিবে ক্রমে ক্রমে।

এইরূপ চিন্তা করিয়াই শেষ জীবনে প্রফুল্লচন্দ্র খাদির পরিপূর্ণ সমর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি নিজে বৃহৎ ব্যবসায়ীমণ্ডলীর সহিত জড়িত ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু দেশবাসীর কল্যাণ সাধনের শক্তি যে কুটীর শিল্পেরও কম নহে, ইহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন তিনি।

বলিয়াছি যে প্রফুল্লচন্দ্র খাদিকে সমর্থন করিয়াছিলেন। অন্য আরও অনেকে করিয়াছিলেন বই কি! খাদির ব্যবসা ফাঁদিয়া মহাত্মার অনেক ভক্ত শিষ্য রীতিমত বড় মানুষ হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে-শ্রেণীর সমর্থকদের সহিত প্রফুল্ল চন্দ্রের মূলতঃ পার্থক্য ছিল। সেপার্থক্য কোথায়, তাহাই বলি।

অন্যেরা খাদি হইতে লাভ করিয়াছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্র করিয়াছিলেন খাদির জন্য প্রভূত ত্যাগ। মাঝে মাঝে ছোটখাট দান পূর্বেও করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁহার সর্বজীবনের সঞ্চয় তিনি দান করিয়া গেলেন খাদির প্রসারকল্পে। এই দান নিতান্ত অপ্রচুর নহে, পরিমাণ ইহার ৫৬০০০ টাকা। দানবীর তাঁহার সর্বস্বদান করিয়া গেলেন এই কামনায় যে খাদি উপলক্ষ করিয়া দেশবাসী নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখুক। কারণ আচার্য্যদেবের কায়মনে বিশ্বাস ছিল যে স্বাবলম্বন ভিন্ন দেশবাসীর মুক্তি নাই!

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

যখন চিন্তা করা যায়—যে এই প্রভূত পরিমাণ দানের অর্থ তাঁহার অতি ক্লেশের ব্যক্তিগত উপার্জ্জন, পৈত্রিক বিত্ত নহে বা দৈবলব্ধ সম্পদ নহে, তখন বিস্ময়ে হতবাক হইতে হয়। এমন নির্লোভ, স্বার্থচিন্তাশূন্য ত্যাগবীর পৃথিবীতে কোন্ দেশে কয়জন জন্মিয়াছেন ?

সারাজীবন তিনি দেশের জন্য চিন্তা করিয়াছেন, কাজ করিয়াছেন, ত্যাগ করিয়াছেন। আজ স্যার পি, সি, রায় নামে তাঁহাকে কেহ চেনে না, আচার্য্যদেব নামেই তিনি বাংলায় পূজিত।

১৯৪০ সালেই আচার্য্যদেবের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। কিছুদিন শ্রীপুরে বাস করিয়া স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তিনি আবার কলিকাতায় আসেন ও পরে রাড়ুলিতে যান। তারপর আবার একবার শ্রীপুর যাইয়া স্বল্পকাল থাকিবার পরে, আবার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনীত হন।

১৯৪৩ সালের ২৪শে এপ্রিল এই মহান দেশনায়কের জয়ন্তী উৎসব দেশবাসী কর্তৃক শ্রদ্ধা ও সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হইল। তখন তিনি এতই অসুস্থ যে তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া বহন করিয়া সভামণ্ডপে আনিতে হয়।

অবশেষে ১৯৪৪ সালের ৬ই জুলাই সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিটের সময় বিজ্ঞান কলেজের এক কক্ষে আচার্য্যদেব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলায় তাঁহার শূন্যস্থান আর কি কোনদিন পূর্ণ হইবে ? চিরকুমার ব্রহ্মচারী জ্ঞানবীর, ঋষিকল্প আচার্য্য এই ঘোর কলিতে সত্যযুগসুলভ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে আদর্শ আর কি এ দুর্ভাগা দেশ কোনও দিন দেখিতে পাইবে।

— শেষ —

কয়েকটি গল্পের বই

শরৎ-সাহিত্য-ভবন

১৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, শ্যামবাজার, পোঃ বক্স ১৬৬১০, কলিকাতা